Reg. No. DA.—142.

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

১লা মার্চ্চ, '৫৬ ; ১৭ই ফাল্গুণ, ১৩৬২

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য (বা কাগজ পাওয়ার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ) থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহ্‌মদী' 'বৎসর' মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা

নব পর্য্যায়—৯ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, March 1, 1956 | ২১ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

পরলোকে আবদুল হাফীজ

গত ৬ই মার্চ অপরাহ্ন বেলা ২-৪৫ মিনিটের সময় ভ্রাতা মৌলবী মহম্মদ আবদুল হাফীজ সাহেব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওইন্না ইলাইহে রাজেউন। হাফীজ সাহেব একজন পুরাতন আহমদী ছিলেন। তিনি ১৯২২ সালে আহমদীয়া জমাতে দাখেল হন এবং তদবদি অত্যন্ত এখলাছের সাথে জমাতের খেদমত করিয়া যান।

তিনি একজন সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার কথা-বার্তায় এবং প্রবন্ধাদির মধ্যে সর্ব্বদাই যুক্তির প্রাধান্য ও মৌলিকতার ছাপ থাকিত। তিনি হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ও হজরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর কিতাবাদি উর্দ্দু হইতে বাংলাতে তরজমা করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়াও তিনি 'কিশতিয়ে নূহ' 'এক গলতিকা এজালা' এবং "আহ্‌মদীয়তের পয়গাম" এই কয়েকটি কিতাবের তরজমা করেন। তিনি বহু প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "খাতামান্নবীঈন" পুস্তক বাংলা আহ্‌মদীয়া সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইদানিং যে কয়টি প্রচার পত্র লিখেন তাতে বার্দ্ধক্য আসিয়াও তাঁহার চিন্তাশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই তাহাই প্রমাণিত হয়।

আহমদী পত্রিকার গোড়া পত্তন হইতেই তিনি নানাভাবে ইহার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি অনেক সময় একক ভাবেই এই পত্রিকার পরিচালনার কাজ আঞ্জাম দিয়াছেন। ইহার উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

হজরত আমীরুল মোমেনীন হাফিজ সাহেবকে প্রাদেশিক আঞ্জুমনে আহমদীয়ার নায়েবে আমীর নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া তিনি ই, পি, এ, এ'র ট্রেজারের কাজ করিয়াছেন। জমাতের কাজ করিতে যাইয়া অনেক সময়েই তিনি নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া যাইতেন।

দুনিয়াবী জিন্দিগিতেও তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্ম্ম নৈপুন্যের দরুণ বেশ তরক্কি করিয়াছিলেন। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করিয়া সামান্য ৩৫৲ টাকা বেতনের কেরাণিরূপে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। তৎপর ক্রম উন্নতি করিতে করিতে এসিস্‌টেন্ট সেক্রেটারীরূপে গত ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অফিসাদিতেও তিনি কাজের জন্য বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবগণকে সর্ব্বদা যথাসাধ্য উপদেশ ও আর্থিক সাহায্য করিতেন। খাছ করিয়া গরীব ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই তৎপর ছিলেন।

তিনি মুক্ত বুদ্ধি, যুক্তিবাদী এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, দৃঢ় সংকল্প ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। খোদাতালা, হজরত রসুল করীম ছাঃ এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদের আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জান, মাল, সময়, ইজ্জত সবকিছু দিয়া খেদমত করিতে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার একটি বিশেষ খাহেশ ছিল যে সম্পূর্ণ-ভাবে কোরআন করীমকে ভিত্তি করিয়া রসুল করীম ছাঃ এর জীবনী লিখার—তাঁহার সে খাহেশ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আল্লাহতা'লা তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়াছেন।

মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে পূর্ব বাংলার কৃতি সন্তান সুফি মুতিউর রহমান সাহেবও পরলোক গমন করিয়াছেন। এই সকল লোক প্রাথমিক যুগে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া আহ্‌মদীয়ত কবুল করেন। তজ্জন্য তাঁহা-দিগকে ঘরে বাহিরে বহু বিপদ আপদের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু তাঁহারা ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাঁহাদের কোরবাণী কবুল করুন। আমীন।

একটি জীবন্ত ও জাগ্রত জামাতের লক্ষণই হইল যে ইহার কর্ম্মীদের স্থান কখনও অপূরণীয় থাকে না। ইহাদের স্থান পূরণ করিতে হইলে আমাদের যুবকদিগকে তাঁহাদের জীবনের সাথে গভীরভাবে পরিচয় লাভ করিতে হইবে এবং তাহা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিতে হইবে। তা,ছাড়া সত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বপ্রকার সাধনা ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একে একে পুরাতন কর্মীরা আমাদের নিকট হইতে স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নিতেছেন। সুতরাং জামাতকে কর্ম্মী সৃষ্টির দিকে বিশেষ ভাবে তৎপর হইতে হইবে এবং যুবকগণকে জামাতের খেদমতের জন্য এগিয়ে আসিতে হইবে নতুবা আহমদীয়তের বিজয় দূরে সরিয়া যাইবে বা আল্লাহতা'লা আমাদের স্থানে অন্য লোক নিয়া আসিবেন। উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য অত্যন্ত বদকিছমতের কারণ হইবে।

সর্ব্বশেষে সর্ব্ব মংগলময়ের দরগাহে মোনাজাত করি তিনি যেন মৃতের রুহের মাগফেরাত করেন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের হৃদয়ে সান্তনা দান করেন ও সর্ব্বোপরি জামাতে পুরাতন কর্ম্মীদের স্থান পূরণের অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলেন। আমীন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র-বিধি

বিগত ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের 'গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' দ্বারাই পাকিস্তান শাসিত হইয়া আসিতেছিল। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যগণ দীর্ঘ সাড়ে আট বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী কোন রাষ্ট্র-বিধি প্রনয়ণ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাতে দেশ-বিদেশে পাকিস্তানের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। কিন্তু আজ খোদার অপার কৃপায় অবশেষে নব-গঠিত গণপরিষদের সদস্যগণ পাকিস্তানের রাষ্ট্র-বিধি প্রনয়ণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ইহা পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদনও লাভ করিয়াছে। আমরা এই আইনের নকল এখনও প্রাপ্ত হই নাই। তবে পাক রাষ্ট্রের নব-নির্ব্বাচিত নাম হইয়াছে 'ইসলামিক রিপাব্লিক অব পাকিস্তান' অর্থাৎ পাকিস্তান ইসলামিক গণতন্ত্র। ইহার সভাপতি মোসলমান হইবেন এবং ইহার আইন কানুন কোরান ও সুন্নাহর সঙ্গে সমঞ্জস হইবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ পূর্ব্ব ও

পশ্চিম পাকিস্তানের সম-সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-গুলির হাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই আইন অবশ্য সর্ব্ববাদী-সম্মত হয় নাই বা ইহাতে পূর্ব্ব বঙ্গের সমস্ত দাবী দাওয়াও স্বীকৃত হয় নাই! আমরা এই কথাও বলিতে চাই না যে এই আইনে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নাই। কিন্তু এই আইনে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়-বিচার এবং সমান সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে। ধর্ম্ম-মতের জন্য কাহারও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারিবে না। দেশ-বিদেশে এই রাষ্ট্র-বিধি অভিনন্দিত হইয়াছে। সুতরাং আমরাও এই অভিনন্দনে যোগদান করিয়া আশা করিতেছি যে ইহাতে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়কদের সদিচ্ছায় ধীরে ধীরে তৎসমুদয়ের সমাধান হইবে। সভাপতি মোসলমান হইবে এবং এই রাষ্ট্রের নাম ইসলামিক রিপাব্লিক হওয়াতেও অমুসলমান সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীতে অনেক দেশের রাষ্ট্র-পতি সম্বন্ধেই এরূপ বিধান রহিয়াছে। যেমন ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীকে সর্ব্বদাই এ্যাংলিক্যান চার্চ্চের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে ইত্যাদি। মোটের উপর এই রাষ্ট্র-বিধি প্রনয়ণে সকল সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের অবসান হইয়াছে, এবং জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরা এই শুভ-কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া দোওয়া করিতেছি যে আল্লাহ পাকিস্তানের এই রাষ্ট্র-বিধিকে সমস্ত নাগরিকের জন্য ইহ-পরকালের মঙ্গল বিধানের কারণ করুন। আমীন!

বিবিধ প্রসংগ

বুদ্ধ-জয়ন্তী—বিগত ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মের ২৫০০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এতদোপলক্ষে বিপুল যাকযমকের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাওজানের বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধের জন্মের ২৫০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় আবু হোসেন সরকার এই বিরাট অনুষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে এক সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্ত জেলাবাসী বৌদ্ধ-গণ ব্যতীত ভারত, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতিনিধিও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অমোসলমান অধিবাসীগণ কিরূপ নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করে, পাকিস্তান মোসলেম প্রধান দেশ হইলেও অমোসলমান সম্প্রদায় সমূহও যে এখানে সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে পারে, পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধ সম্প্রদায় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবীর বড় বড় কয়েকটি ধর্ম্মের অন্যতম। প্রাচীন ভারতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল কিন্তু ভারতে আজ বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। ভারত বিতাড়িত বৌদ্ধ ধর্ম্ম আজ সিকিম, ভুটান, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি দেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। পাক ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে মাত্র পূর্ব্ব পাকিস্তানেই উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী-দের বাস। ইহা স্বাভাবিকই হইয়াছে। এক দিকে ইসলাম যেমন সমস্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য, তেমনি সমস্ত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী-দের প্রতি সহিষ্ণুতার ভাব পোষণ ও প্রদর্শন করিতেও বাধ্য। বৌদ্ধদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে যে কলি যুগে বুদ্ধদের পুনরাবির্ভাব হইবে। আমরা বিশ্বাস করি যে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হজরত মীরযা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)ই কলি যুগে বৌদ্ধের সেই প্রতিশ্রুত অবতার। আশা করি আমাদের পাকিস্তানী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাগণ আমাদের কথার যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে যত্নবান হইবেন। আমরা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান—পাকিস্তানের পত্তন হইয়াছে আজ মোটে সাড়ে আট বৎসর। কিন্তু এরই মধ্যে পাকিস্তানের যুবক-গণ আন্তর্জ্জাতিক ক্রিড়া জগতে বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। পাকিস্তানী ক্রিকেট দল মাত্র কিছু দিন আগে ইংলণ্ডে গিয়া ইংলণ্ডের দুর্দ্ধর্ষ এম, সি, সি, (মার্লিবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব)এর সঙ্গে কয়েকটি প্রতিযোগীতামূলক খেলা খেলিয়া সফলতার জয়-তিলক লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। এবার ইংলণ্ডের সেই ক্রিকেট দল পাকিস্তানে আগমন করিয়াছে এবং পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে পাকিস্তান দুইটিতে ড্র করিয়াছে এবং দুইটি খেলা জিতিয়া ইংলণ্ডের উপর তাহাদের বিজয়ের ইতিহাসকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্রিড়া জগতে তরুণ পাকিস্তানের এই আশাতীত সফলতা বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশ-বিদেশে পাকিস্তানের সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার নিকটে এই প্রার্থনা করি যে ক্রিড়া-ক্ষেত্রের এই সফলতা পাকিস্তানীদের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিস্তারিত হউক। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্ব্বদিক দিয়া পাকিস্তান দুনয়াতে রেকর্ড স্থাপন করুক। আমীন।

নদীর বাঁধ—পূর্ব্ব পাকিস্তান নদী-মাতৃক দেশ। নদীগুলির অধিকাংশই পাকিস্তানের উত্তরস্থ ভারতের পাহাড়-পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া এ দেশের উপর দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। পরিমিত বৃষ্টি পতিত হইলে এক দিকে যেমন নদী তার অববাহিকাকে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করিয়া তুলে, অপরিমিত বা অতি বৃষ্টি হইলেও তেমনি আবার সেই অববাহিকায় অনুষ্ঠিত হয় প্লাবনজনিত তাণ্ডবলীলা। তাহার ফলে বাড়ী-ঘর, শস্য, গরু-বাছুর কিছুই রেহাই পায় না। গত দুই বৎসর যাবত পূর্ব্ব পাকিস্তানে আমরা ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আবার কোন কোন বৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ চাষের জমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল-প্লাবন না হওয়ায়ও ফসল নষ্ট হইতে দেখা যায়। পৃথিবীর উন্নত দেশ-গুলিতে বড় বড় নদীতে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া জল নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের আংশিক ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করা হয়। এই সমস্ত বাঁধের দ্বারা যে শুধু জল সিঞ্চনের কার্য্যই করা হয় তাহা নয়, নদী হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, নদীর জলের ধারাও গভীরতা অব্যাহত রাখিয়া নৌ-চলাচলের এবং মৎস্য চাষের নূতন নূতন সুবিধার সৃষ্টি করা হয়। পূর্ব্ব পাকিস্তানে কর্ণফুলী নদীর কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা এবং গঙ্গা কপোতাক্ষ নদী সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি এই পর্য্যায়ে পড়ে। এই দুইটি পরিকল্পনার কার্য্য কতকটা অগ্রসর হইয়াছে বটে কিন্তু আশানুরূপ ত্বরান্বিত যে হয় নাই ইহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমানে আবার পূর্ব্ববঙ্গ সরকার তিস্তা নদীতে এক বাঁধের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং রংপুর হইতে ৩৮ মাইল দূরবর্ত্তী খাড়ী জাগুলা নামক স্থানে পরিকল্পনার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণতঃ হইলে যে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে, লোকে স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইবে, বহু অনাবাদী জমিতে ফসল জন্মিবে, বহু আবাদী জমিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কবে এই সমস্ত পরিকল্পনার উপকারিতা সংবাদ-পত্রে বর্ণনার স্তর পার হইয়া জনগণের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই বড় কথা। আমরা আশা করি, জনগণের সরকার এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া জনগণের দুঃসহ ভার লাঘব করিতে আর কাল বিলম্ব করিবেন না। দেশের লোক প্ল্যান-পরিকল্পনার কথা অনেক শুনিয়াছে, তাহারা এখন চায় কাজ।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশীয় সন্ধি সংস্থা—আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড এই আটটি রাজ্যের সমন্বয়ে এই সঙ্ঘ গঠিত। থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ইহার হেড্ কোয়ার্টারস্। সম্প্রতি ৬ই, ৭ই এবং ৮ই মার্চ্চ, ১৯৫৬ ইং তারিখে করাচীতে এই সঙ্ঘের মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র পুঞ্জের বৈদেশিক মন্ত্রীদের সমন্বয়েই ইহার মন্ত্রী পরিষদ গঠিত। সম্মেলনের অধিবেশন গোপনে হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-গণ স্ব স্ব বক্তৃতায় ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষা, এতদঞ্চলকে কম্যুনিজমের অনুপ্রবেশ বা আওতা হইতে নিরাপদ রাখা, অঞ্চল ভুক্ত দেশ-সমূহের সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন প্রভৃতিই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। কোন দেশের প্রতি আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করা ইহার উদ্দেশ্য নয়। এই সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধিবেশনে পাকিস্তানের অনুকূলে দুইটি বড় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি আফগানিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর

পশ্চিম দিকস্থ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উপজাতীয় এলাকা, বেলুচিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া **পাখ্তুনিস্তান** নামক একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের জন্য এক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। অপর দিকে ভারতও নিরপেক্ষ গণভোটে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ণয়ের নীতি বর্জন করিয়া বসিয়াছিলেন। কথা এই যে কম্যুনিষ্ট রুশের দুই প্রধান বুলগেনিন এবং ক্রুশেভ সম্প্রতি তাঁহাদের ভারত ও আফগানিস্তান ভ্রমণের সময় ভারতের কাশ্মীর নীতির এবং কাবুলের পাখ্তুনিস্তানের উদ্ভট দাবীর সমর্থন করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশীয় শক্তি সম্মেলনের আলোচ্য সভায় কাশ্মীর ও পাখ্তুনিস্তান প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, সম্মেলন 'ডুরাণ্ড লাইনকে' অর্থাৎ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বর্ত্তমান সীমা রেখাকে আন্তর্জ্জাতিক সীমা রেখা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং কাশ্মীর সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে ইউ, এন, ও'এর সিদ্ধান্ত অনুসারে নিরপেক্ষ গণভোট দ্বারাই কাশ্মীরের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে আফগানিস্তান এবং ভারত উভয় দেশেই বেশ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান যে এই দুই ব্যাপারে কিছুতেই স্বীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না, ইহা এই দুই দেশের পূর্ব্বেই বুঝা উচিত ছিল। আমরা আশা করি ভারতের সুমতি হইবে এবং ভারত কাশ্মীর সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত অনুসারে অবিলম্বে নিরপেক্ষ গণভোটের ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়ন করিয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে পরস্পর শান্তি ও সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করিবেন। উহাতে উভয় রাজ্যেরই দেশ-রক্ষা খাতে বিপুল ব্যয় সঙ্কোচ হইবে এবং সেই অর্থ জনকল্যাণে ব্যয়িত হইতে পারিবে।

অতীতকে ভুলো না

যে জাতি নিজের অতীতকে ভুলিয়া যায়, বর্তমানের প্রতি উদাসীন থাকে এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় আশাবাদী না হয় সে জাতি কখনও তরক্কী করিতে পারে না। প্রকৃতির এই সাধারণ নিয়ম হইতে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতি সমূহও বাদ পড়ে না—আহমদীরা জামাতও ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

বর্তমানের কর্মপ্রেরণা ও ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় আশাবাদী হওয়ার একটা মূল উপাদান হইল—অতীতের সাথে যোগসূত্র সাধন। এই যোগসূত্র সাধনের একটা পথ হইল—জাতির জন্য যারা অতীতে নানাভাবে ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের জীবন নিয়া আলোচনা করা।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল বাংলা দেশে আহমদীয়ত প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ের মধ্যে বহু বুজুর্গানে দীন নানাভাবে আহমদীয়তের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রাথমিক যুগে অনেককেই ঘরে বাহিরে বহু বিপদ-

জুমার খুৎবা

"আমাদের মধ্যে ক্রমাগত দীনের খাদেম তৈয়ার হইতে না থাকিলে ইস্‌লাম বিজয় লাভ করিতে পারিবে না"

—খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী (আইঃ)

অনুবাদ—এ, এইচ, এম, আলী আন্‌ওয়ার

রাবওয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

সুরাহ্ ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর বলেন :—

ডাক্তারেরা আমাকে তাকিদ করিয়াছিলেন গ্রীষ্মকালে যেন আমি এখানে না থাকি। এখানে এমন ভীষণ গরম পড়িয়াছে যে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার কষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। এ জন্য আমি ভাবিয়াছিলাম, খুৎবার জন্য মস্‌জিদে আসা আমার সঙ্গত হইবে না। কিন্তু আমি দীর্ঘকাল পর রাবওয়া আসিয়াছি, সুতরাং নিজে মস্‌জিদে আসিয়াই দুই চারিটি কথা সংক্ষেপে বলা সমীচীন মনে করিলাম। আমি মস্‌জিদে আসিবার পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল, যেন কোন বন্ধু আমার সহিত 'মোসাফাহ্' না করেন। কারণ, আমার স্বাস্থ্যের উপর গরমের ভীষণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। গরম একটু কমিলে আমি পুরাপুরি বাহিরে আসিতে পারিব।

ইউরোপে থাকাকালে আমাকে প্রতি বৎসরই কিছু সময়ের জন্য সেখানে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে ঋতু দ্বারাও উপকৃত হওয়া যায় এবং ডাক্তারেরও পরামর্শ লাভ করা যায়। কিন্তু এ সব ভবিষ্যতের কথা এবং আল্লাহ্ তা'লার মরজির উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতে যাহা আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত, তাহাই হইবে। মানুষের কথা, ডাক্তারদেরই হউক আর অন্যদেরই হউক, সবই আনুমানিক। আমার মনে যাহা আছে, তাহা এর চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু আমি বলিয়াছি, গরমের দরুণ আমার স্বাস্থ্যের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। মনে হইতেছে, যেন কেহ আমার দেহ নাড়িতেছে, আমি ঝুলিতেছি। এ জন্য আমার স্থিরভাবে দাঁড়ানই মুশ্‌কিল।

যাহা হোক, আমি একটি বিষয়ের প্রতি জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আপনারা সকলেই বলেন, হজরত মসিহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতুস্-সালাম ছিলেন রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের খাদেম। তিনি আসিয়াছিলেন "ইসলামের ইশাআত" বিস্তারের জন্য। যদি আপনাদের এই দাবী সত্য হইয়া থাকে, তবে আপনাদিগকে এই কাজের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে, যাহার জন্য হজরত মসিহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাত-ওস্ সালাম পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে এখন আড়াই অর্ব্বুদ লোকের বাস। কিন্তু আমাদের মাত্র দেড় শত মোবাল্লেগ বিদেশে কাজ করিতেছে এবং ত্রিশ চল্লিশ জন এখানে প্রস্তুত হইতেছেন। অন্য কথায়, এখনো কাজের প্রারম্ভ মাত্র। প্রথমে যাঁহারা জীবন ওয়াকফ্ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানদের কেহই ওয়াকফের কাছেও আসে নাই। যদি তোমরা তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর, তবে ইহা একটি তামাসার বস্তু হইবে।

সর্ব্বপ্রথম হজরত মসিহ মাওউদ (আলায়হেস্ সালাতুস্ সালাম) তাঁহার জীবন ওয়াক্‌ফ করেন। কিন্তু তাঁহার খান্দানে শুধু আমার সন্তানেরাই ওয়াক্‌ফ করিয়াছে। বাকী সকলেই মাসিক নয় শত আর হাজার টাকার ফের পড়িয়াছে। বলিতে কি, গোড়াতেই ঝরনা ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। হজরত মসিহ্ মাওউদ (আলায়হেস্ সালাতুস্ সালাম) বয়েত নেওয়ার সময় প্রত্যেকের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইতেন যে দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে হইবে। ইহার অর্থ শুধু এই : এখানে ৫০৲ টাকা পাওয়া গেলে, বাহিরে ৫০০৲ টাকা পাওয়া গেলেও ৫০৲ টাকাই অগ্রগণ্য হইবে। এখন, এই অঙ্গীকার গ্রহণকারীর সন্তানেরা কি করিতেছে? তাহাদের কেহ পনর শত বা দুই হাজারের চিন্তায় মগ্ন। অন্যদের আবার কসুর কি? তাহারা ত বলিবে, অঙ্গীকার গ্রহণকারীর সন্তানেরাই পনর শত এবং দুই হাজারের পাকে নিপতিত। আমরা কেন ইহা করিব না? অথচ, প্রকৃত কথা হইল, আমরা সকলেই ঐ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি, যাহা হজরত মসিহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতুস্ সালামকে খোদাতা'লা দিয়াছিলেন এবং ঐল্‌হামযোগে জানাইয়াছিলেন :—

"ইয়েহ্ তেরে লিয়ে আওর তেরে
সাথ্‌কে দরবেশোঁকে লিয়ে হায়।"

আপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আমাদের অনেকেই তাঁহাদের আদর্শগত জীবনযুদ্ধের সাথে পরিচিত নন—এমনকি তাহাদের নাম নিশানাও আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। এই জামাতের মধ্যে নতুনভাবে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্য নিয়া আহ্‌মদী ভ্রাতা ভগ্নীগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি তাহারা যেন আমাদের যে সকল ভ্রাতা ভগ্নীরা আহমদীয়তের জন্য জান মাল কোরবান করিয়াছেন—তাঁহাদের জীবনী বা জীবনের ঘটনাবলী নিয়া আহমদী পত্রিকাতে আলোচনা করেন। ইহাতে মরহুমদের কোন উপকার হউক না হউক—আমরা উপকৃত হইব নানাভাবে। সাড়া পাইলে এই নিয়া আমরা আহমদী পত্রিকায় 'অতীতকে ভুলো না' নামে একটি নতুন কলাম খুলিব।

খাকছার—
মোহম্মদ মোস্তাফা আলী
সেক্রেটারী তালিফ ও তছনীফ, ই পি, এ, এ

('ইহা তোমার জন্য এবং তোমার সঙ্গের দরবেশগণের জন্য')

খোদাতা'লা বলেন নাই, "ইহা তোমার জন্য এবং তোমার সন্তানগণের মধ্যে যাহারা সরকার হইতে পনর শত বা দুই হাজার নিবে, তাহাদের জন্য।" ইহা খোদাতা'লার দানের অপব্যবহার নয় ত আর কি? উচিত ছিল, তাঁহার সন্তানেরা ভবিষ্যতে হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করিতে থাকিবে এবং পার্থিব উপার্জ্জনের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। অন্যেরা মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইলেও তাহারা তৎপ্রতি তাকাইবে না এবং দ্বীনের খেদমত করিতে যাইয়া মাসিক ৫০৲ টাকা পাইলেও হৃষ্ট-চিত্তে তাহাই গ্রহণ করিবে।

স্মরণ রাখিবে, দৈহিক সন্তানেরাই শুধু ওফাদার হয় না, বরং অধিকাংশ স্থলে দেখা গিয়াছে যে, রুহানী সন্তানগণ বিশ্বস্ত প্রমাণিত হয় এবং দৈহিক সন্তানেরা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে না। যদি আপনারা দেখিতে পান যে হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাতুস্‌ সালামের দৈহিক সন্তানেরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছে বলিয়া প্রমাণ হইতেছে, তবে আপনারা ইহা বলিলেন না যে, তাঁহার দৈহিক সন্তানেরা ভাল আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে না বলিয়া আপনারাও তাহা করিবেন না। স্মরণ রাখিবেন, আপনারাও হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাতুস্‌ সালামেরই সন্তান। তাঁহারা দৈহিক সন্তান, আপনারা রুহানী সন্তান। যদি আপনারা তাহাদিগকে দ্বীনের ব্যাপারে বেপরওয়া ভাব ধারণ করিতেছে বলিয়া দেখিতে পান, তবে বাম দিকে থুথু ফেলিবেন এবং তাহারা শয়তানের কবলে নিপতিত হইয়াছে মনে করিয়া নিজেরা দ্বীনের খেদমতে মশগুল হইবেন।

এখন সারা দুনিয়া ইসলাম সম্বন্ধে অপরিচিত। আমাদিগকে আড়াই শত কোটি আদম সন্তানকে ইসলামের দিকে আনিতে হইবে। সুতরাং শত কোটি জন-মানবকে ইসলামের দিকে আনার প্রস্তুতি করুন এবং প্রথম দিন হইতেই আপনাদের লক্ষ্য স্থির করুন—আপনাদের সন্তান-দিগকেও তাকিদ করুন যে সমগ্র বিশ্ববাসীকে কলেমা পড়ান তাহাদেরই কাজ। আপনারা যখন সমগ্র বিশ্ববাসীকে কলেমা পড়াইতে সমর্থ হইবেন, তখন আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই সুন্দর হইবে। বদ্ধ পাগলও বুঝিতে পারে যে যখন সমগ্র জগতই কলেমা পড়িবে, তখন ইংরাজ কেন, বিশ্বের সমস্ত জাতি তোমাদের গোলামী করিবে। তোমরা কি মনে কর, যদি আমেরিকার সমস্ত অধিবাসী মোসলমান হয়, তবে সেখানে আমাদের যে মোবাল্লেগ এখন মুজুরদের চেয়েও অল্প উপজীবিকায় কাজ করিতেছে, এই অবস্থায়ই থাকিবে? ঐ সকল লোকেরা কি তাহাদের ধন সম্পদ তাহাদের নিকট পেশ করিবে না? অবশ্য, তোমরা দুনিয়াও পাইবে। কিন্তু পাছে দুনিয়াই তোমাদের লক্ষ্য না হইয়া পড়ে এ জন্য আমি ইহাতে জোর দিতেছি না। নতুবা, প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, আজ যাহারা ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে জীবন ওয়াক্‌ফ করিবে এবং দুনিয়ার পরওয়া করিবে না, একদিন আসিবে, যখন পৃথিবী তাহাদের দিকে দৌড়াইয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু এখন শুধু তোমরা ধর্ম্মকেই সম্মুখে রাখিবে। হাজার দুই হাজার বা দশ হাজারের চক্রে পড়িবে না। শুধু ইহাই লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিবে যে, উপবাস করিয়া হইলেও রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের কলেমা সারা বিশ্বকে পড়াইবেই পড়াইবে।

আমার স্মরণ আছে, হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাতুস্‌ সালামের নিকট জনৈক বেদেনী আসিয়াছিল। তাহার পুত্র খৃষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছিল এবং ক্ষয় রোগে ভুগিতেছিল। হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাতুস্‌ সালামের নিকট নিবেদন করিল, আমার এই একমাত্র পুত্র খৃষ্টিয়ান হইয়াছে এবং সে যক্ষা রোগেও ভুগিতেছে। আপনি তাহাকে তবলীগ করুন, যেন সে আবার ইসলাম কবুল করে। আর তাহার চিকিৎসাও করুন।" হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাম তাহার চিকিৎসার জন্য হজরত খলিফা আও্‌আল্‌ রাজি আল্লাহু আন্‌হুকে নির্দ্দেশ দিলেন এবং নিজে তাহাকে তবলীগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে এমন গোড়া খৃষ্টিয়ান ছিল যে, তিনি যতই তাহাকে তবলীগ করিতেছিলেন, সে ততই খৃষ্টিয়ান মন্ত্রে পাকা হইতেছিল। এক রাত্রি তাহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। মধ্য রাত্রিতে সে পলাইয়া বাটালাভিমুখে যাইতে লাগিল। সেখানে খৃষ্টিয়ান-দের মিশন ছিল। তাহার মা টের পাইয়া রাত্রেই এই ১১ মাইলের সফরে রওয়ানা হইল এবং কাদিয়ান হইতে ৮।৯ মাইল ব্যবধান দাওয়ানী নামক স্থানের কাছে তাহাকে ধরিল। কাদিয়ান প্রত্যাগমনের পর আমার স্মরণ আছে, তাহার মা হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালামের পায়ের উপর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল, "আমি আপনাকে খোদার দিব্য দিতেছি, আপনি তাহাকে একবার কলেমা পড়াইয়া দিন। তারপর, সে মরুক। সে জন্য আমার কোন পরওয়া নাই। কিন্তু সে খৃষ্টিয়ান থাকা অবস্থায় মরিবে, এ' আমি চাই না।"

দেখ, এই মিরাসী স্ত্রীলোকটির ইমান কেমন ছিল। হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়হেস্‌ সালাতুস্‌ সালামের আত্মিক ও দৈহিক সন্তানদের মধ্যে এই মিরাসী মেয়ে লোকটির সমান ইমান ত থাকিতেই হইবে। তাহার পুত্র খৃষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু সে মরুক, ইহা তাহার অসহনীয় ছিল। তাহার এক মাত্র আগ্রহ ছিল, তাহার পুত্র একবার কলেমা পাঠ করুক। তারপর, সে মরে মরুক। তোমরা ত মোসলমানের 'ঘরে' জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমরা অন্যদিগকে এক বার কলেমা পড়াইবে, ইহা তোমাদের পক্ষে আরো কত জরুরী। তারপর, অবশ্য তোমরা মরিতে পার।

তোমরা 'ক্রমাগত ওয়াক্‌ফ' করিবার তহ্‌রীক করিতে থাক। তারপর, প্রত্যেক ওয়াক্‌ফকারীকেই দেখিতে হইবে যে, তাহার সন্তানদের মধ্যে দ্বীনের খেদমত করিবার কেমন উৎসাহ আছে। যাঁহারা ওয়াক্‌ফ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সন্তানেরা দ্বীনের খেদমতের জন্য জীবন তাহা করে নাই। শুধু আমার সন্তানেরা দ্বীনের খেদমতের জন্য তাহাদের জীবন ওয়াক্‌ফ করিয়াছে। খোদা করুন, দ্বীনের খেদমতের জন্য তাহাদের এই উৎসাহ উদ্দীপনা কায়েম থাকে এবং পরে তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ তাহাদের জীবন দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করিতে থাকে এবং হজরত মসিহ্‌ মাওউদ আলায়-হেস্‌ সালাতুস্‌ সালামের অবশিষ্ট সন্তানেরাও বুঝিতে পারে যে, পনর শত বা দুই হাজার টাকা মাসিক উপার্জ্জন কিছুই নয়।

আসল কথা হইল যে মানুষ ধর্ম্ম সেবায় জীবন অতিবাহিত করিবে। আমার সঙ্গে যাঁহারা ওয়াক্‌ফ করিয়াছিলেন, চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব তাহাদের অন্যতম। উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার পর এক ছেলেকে দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করিবার তৌফিক খোদাতা'লা চৌধুরী সাহেবকে দিয়াছেন। আর একজন হইলেন দরদ্‌ সাহেব। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে কোন ছেলে ভাল লেখা-পড়া শিখিলে তিনি তাহাকে দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করিতেন। কিন্তু এমন পর্দ্দা পড়িয়া রহিয়াছে যে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে কেহ দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ হওয়ার যোগ্য হয় নাই। আর সকলেরই ঘর খালি। অথচ, ইসলাম পৃথিবীতে তখন পর্য্যন্ত কখনো বিজয়ী হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে আমাদের মধ্যে জীবন ওয়াক্‌ফকারী লোকদের সৃষ্টি না হয়। দেখ, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর এক বুজুর্গ হজরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী (রহমতুল্লাহে আলায়হে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ভারত-বর্ষে ইস্‌লামের বিস্তার সাধন করেন। তাঁহার পর তাঁহার খলিফাগণ হইয়াছেন। তাঁহারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম বিস্তার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, হজরত খাজা ফরীদ উদ্দীন সাহেব সমগ্র পাঞ্জাবে ইসলাম বিস্তার করেন। তারপর, তাঁহার কোন কোন শাগরেদ দক্ষিণাত্যে যাইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেন। যখন তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন এ দেশের লোক সংখ্যা মাত্র এক কোটি ছিল। কিন্তু তোমাদের সম্মুখে আড়াই শত কোটি লোক বিদ্যমান। ইহা-দিগকে হেদায়েতের দিকে আনার ভার তোমাদের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে।

যদি ভারতবর্ষের এক কোটি অধিবাসীর জন্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে একা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী (রহ)এর প্রয়োজন হইয়াছিল, তবে বর্ত্তমানে আড়াই শত কোটি মানুষের জন্য দুই শত বর্ষ ব্যাপী বহু মঈন উদ্দীন চিশতী সদৃশ ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে। আর এইরূপ মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী সৃষ্টি করা কঠিন নয়, যদি তোমরা ইহার জন্য চেষ্টা কর এবং শুধু তোমাদেরই নয়, বরং তোমাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ওয়াক্‌ফের সিলসিলা (প্রথা) জারি থাকে।

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আইয়্যাম্-উস্-সোলেহ (শান্তির যুগ)

(৬)

গ্রন্থকার—আখেরী জমানার ইমাম মাহ্দী ও মসিহ্ মউদ হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ)

অনুবাদক—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

[পূর্ব্ব প্রকশিতের পর]

[সুরাহ ফাতেহার তফছির দিবার উদ্দেশ্য ইমানের সংজ্ঞা]

সুরাহ ফাতেহার এই তফসীর এস্থলে লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা কোরাণের সার। আর যে ব্যক্তি কোরাণ হইতে ইহার বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত করিতে চায় সে মিথ্যাবাদী। আর যেরূপ আমি বলিয়াছি এই সুরাহ ফাতেহায় মোসলমানদিগকে দোওয়ায় তৎপর থাকিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে বরং "ইহ্দেনাস্-সেরাতাল মোস্তাকিম" এই দোওয়া শিখানো হইয়াছে * পাঁচবার এই দোওয়া করা ফরজ (অবশ্য কর্ত্তব্য) করা হইয়াছে। কেহ দোওয়ার আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করিলে কিরূপ ভুলই-না করে। কোরাণ শরীফ এই ফয়সালা দিয়াছে যে দোওয়ার মধ্যে এক আধ্যাত্মিকতা নিহিত আছে এবং দোওয়ায় এক অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয় যাহা **ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে** কৃতকার্য্যতার ফলদান করে।

আমার উপরুক্ত আলোচনা হইতে প্রত্যেক ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে যেরূপ কাজা ও কদর (নিয়তির লেখা, আল্লাহর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত ফয়সালা) সত্বেও শত শত ব্যাপারে আল্লাহর সনাতন বিধি এই যে চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা ফল পাওয়া যায় সেইরূপ দোওয়াতেও যে চেষ্টা করা হয়, তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না। আল্লাহতা'লা কোরাণ শরীফের এক স্থলে নিজের পরিচয়ের এই লক্ষণ বর্ণনা করিয়েছেন যে তোমাদের খোদা সেই খোদা যিনি আকুল হৃদয়ের দোওয়া শুনেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন আ ফামাইয়্যা জিবুল মুস্তার্-রা ইযা দাআহু। সুতরাং যখন আল্লাহ-তা'লা স্বয়ং দোওয়ার মঞ্জুরীকে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ সাব্যস্ত করিলেন তখন বুদ্ধিও লজ্জার অধিকারী কোন ব্যক্তি কিরূপে এই রূপ অনুমান করিতে পারে যে দোওয়া করিলে তাহা কবুল মঞ্জুর হওয়ার কোন স্পষ্ট লক্ষণ লাভ হয় না এবং দোওয়া মাত্র আধ্যাত্মিকতা-বর্জ্জিত একটি প্রথা বিশেষ? আমার মতে কোন সাচ্চা ইমানদার এরূপ বে-আদবী করিতে পারে না। যখন মহিমাময় আল্লাহতা'লা বলেন যে যেরূপ পৃথিবী ও আকাশের গুণের বিষয় চিন্তা করিলে সাচ্চা খোদার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি দোওয়া কবুল হইতে দেখিলেও খোদাতা'লার উপর একিন হয়। আবার দোওয়ায় যদি কোন আধ্যাত্মিকতা না-ই থাকিবে এবং প্রকৃত এবং বাস্তব পক্ষে দোওয়ার ফলে কোন স্পষ্ট অনুগ্রহ অবতীর্ণ না-ই হয় তবে পৃথিবী এবং আকাশের যাবতীয় বস্তু ও অণু পরমাণু সদৃশ দোওয়া কিরূপে আল্লাহর পরিচয়ের উপায় হইতে পারে! বরং কোরাণ শরীফ হইতে তো বুঝা যায় যে দোওয়াই খোদা সেনাছির (খোদার পরিচয়ের) সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং মাত্র দোওয়া দ্বারাই খোদাতা'লার অস্তিত্ব এবং পূর্ণ গুণাবলীর সম্যক এবং প্রত্যয়-মূলক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; আর কোন উপায়ে তাহা হয় না। দোওয়াই সেই জিনিষ যাহা মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মত মানুষকে অন্ধকার হইতে টানিয়া আলোর উন্মুক্ত পরিবেশে লইয়া আসে এবং খোদাতা'লার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেয়। দোওয়ার দ্বারা হাজার হাজার দুরাচারীর চরিত্র সংশোধন হয়। হাজার হাজার বিগ্ড়ে যাওয়া ব্যাপার ঠিক হইয়া যায়! হাঁ, দোওয়ার পথে দুইটি কঠিন বিষয় আছে যাহার কারণে অধিকাংশ হৃদয় হইতে দোওয়ার মহিমা প্রচ্ছন্ন থাকে। (১) প্রথম সর্ত্ত হইল তাকওয়া (আত্ম রক্ষা), সাধুতা এবং খোদার ভয় যেমন মহিমাময় আল্লাহ বলিয়াছেন, ইন্নামা ইয়া তাকাব্বালা আল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন অর্থাৎ আল্লাহতা'লা **পরহেজগার (সাধু) লোকদের** দোওয়া কবুল করেন। আরও বলিয়াছেন:— অইজা সালা'কা এবাদী আন্-নী ফা-ইন্নী কারিবুন ওজিবু দাওয়াতুদ্-দায়ে ইজা দা'আনে ফাল্ ইয়াস্তা জিবুলী অল্ ইয়ুমেনুবী লায়াল্লাহুম ইয়ারশুদুন অর্থাৎ যখন আমার বান্দাহ (দাস) আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যে খোদাতা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ কি, তখন উত্তর এই যে আমি অতি নিকটেই আছি অর্থাৎ কোন বড় প্রমাণের প্রয়োজন নাই। আমার অস্তিত্ব অতি সহজ উপায়ে বুঝা যাইতে পারে এবং অতি সহজে আমার অস্তিত্বের প্রমাণ উপলব্ধি হয় এবং সেই প্রমাণ এই যে যখন কোন প্রার্থী আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাক শুনি এবং নিজের বাক্যে তাহাকে তাহার সফলতার সুসংবাদ দেই। তাহাতে শুধু আমার অস্তিত্বেই যে একিন (প্রত্যয়) হয়, তাহা নহে। বরং আমি যে সর্ব্বশক্তিমান তাহাও নিশ্চিত হইয়া যায়। কিন্তু প্রয়োজন এই যে মানুষ নিজের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্ম ভীরুতা এবং খোদার ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি করিবে যে আমি তাহাদের ডাক শুনি। অধিকন্তু আমার উপর ইমান (বিশ্বাস) আনা এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বেই এই কথা স্বীকার করা যে খোদা আছেন এবং তিনি সর্ব্ব শক্তি ও ক্ষমতার আধার (কেননা যে ব্যক্তি ইমান আনয়ন করে তাহাকে এরফান (জ্ঞান) প্রদান করা হয়।

ইমানের সংজ্ঞা—জ্ঞান পূর্ণতায় পৌছিবার পূর্ব্বে এবং দ্বিধা সন্দেহের সঙ্গে সংঘাত সংঘর্ষের বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই মানিয়া লওয়াকে ইমান বলে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমান আনে অর্থাৎ দুর্ব্বলতা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সমস্ত উপকরণ না থাকা সত্বেও প্রবল সম্ভাবনার ফলে সেই কথা গ্রহণ করে, সে এক-মেবা-দ্বিতীয়মের দরবারে সত্যানুবর্ত্তী এবং সাধু বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তারপর ঐশী প্রসাদ-স্বরূপ তাহার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় এবং ইমানের পরে তাহাকে জ্ঞানের পিয়ালা পান করান হয়। সেই জন্য কোন ঈশ্বর ভীরু লোকই নবী রসুল এবং আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণের আমন্ত্রন শুনিলে প্রথমেই সকল দিক দিয়া আক্রমন করিতে চায় না। বরং যে অংশটুকু আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট কোন ব্যক্তির আল্লাহর পক্ষ হইতে হইবার কোন কোন পরিস্কার এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় উহাকে তাহারা নিজেদের স্বীকৃতি এবং বিশ্বাসের উপায় সাব্যস্ত করেন এবং যে অংশ বুঝা যায় না উহাকে সজ্জনদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে রূপক এবং অলঙ্কার সাব্যস্ত করেন এবং এই রূপে মধ্যস্থল হইতে বিরোধ বিদূরিত করিয়া দিয়া স্পষ্টতা এবং আন্তরিকতার সহিত ইমান আনয়ন করেন। তখন খোদাতা'লা তাহার অবস্থা দর্শনে কৃপা পরবশ হইয়া এবং তাঁহার ইমানে সন্তুষ্ট হইয়া এবং তাঁহার প্রার্থনা-সমূহ শ্রবণ করিয়া পূর্ণ জ্ঞানের দ্বার তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া দেন এবং এলহাম (আপ্ত বাণী) এবং জাগ্রত স্বপ্ন-যোগে এবং অন্যান্য স্বর্গীয় লক্ষণাদির মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহাকে একিনে কামেল (পূর্ণ প্রত্যয়) পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন। কিন্তু বিদ্বেষ দুষ্ট শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে না এবং যাহা সত্যের পরিচয়ের উপায় হইতে পারে ঐ সমস্ত ব্যাপারকে সে তুচ্ছতাচ্ছিলের সহিত নিরীক্ষণ করে এবং হাসি-ঠাট্টায় সেগুলিকে উড়াইয়া দেয় এবং যে সমস্ত ব্যাপার তাহার কাছে তখনও সন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হয় সেইগুলিকে সে আপত্তির দলিল স্বরূপ গ্রহণ করে এবং অত্যাচার-প্রিয় লোকেরা সর্ব্বদাই এরূপ করিয়া থাকে। কেননা একথা স্পষ্ট যে প্রত্যেক নবী সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী

---

*এই দোওয়ার উদ্দেশ্য মানব জাতির প্রতি সাধারণ সহানুভূতি প্রদর্শন করা, কেননা এই দোওয়াতে সমস্ত মানব জাতিকে শামিল করা হইয়াছে এবং সকলের জন্য দোওয়া করা হইল। হে খোদা! দুনয়ার দুঃখ তাপ হইতে তাহাদিগকে বাঁচাও এবং আখেরাতের ক্ষতি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর এবং সকলকে সরল পথে আনয়ন কর।

নবীগণ যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সর্ব্বদাই সেইগুলি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক, বাইয়্যেনাত (স্পষ্টোক্তি) এবং মুহকেমাত (আদেশ নির্দ্দেশ) যাহাতে কোন প্রকার রূপক নাই এবং যেগুলি কোনরূপ ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ ছিল না। দ্বিতীয়, মুতাশাবেহাত (অস্পষ্ট বাণী সমূহ) যাহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এবং কোন না কোন রূপক ও অলঙ্কারের পর্দ্দার আড়ালে লুক্কায়িত ছিল। তৎপর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার মূর্ত্ত বিকাশ নবীদের আবির্ভাব কালে দুইটি দল দেখা দিতে লাগিল। একদল ভাগ্যবান লোকদের যাহারা বাইয়্যেনাত দেখিয়া ইমান আনিতে বিলম্ব করিল না এবং মুতাশাবেহাতের যে অংশ ছিল উহাকে রূপক ও অলঙ্কার বলিয়া বুঝিয়া লইল অথবা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রহিল।* এইরূপে তাঁহারা সত্যকে লাভ করিল এবং ব্যাহত হইল না। হজরত ঈসা (আঃ) এর সময়ও এইরূপই হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাবলীতে হজরত মসিহ (আঃ) সম্বন্ধে দুই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এক, এই যে তিনি দীন দরিদ্র বেশে আবির্ভূত হইবেন এবং পরাধীনতার যুগে আসিবেন। তিনি দাউদ (আঃ) এর বংশ সম্ভূত হইবেন এবং ধৈর্য্য ও নম্রতা প্রয়োগ করিবেন এবং অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী এরূপ ছিল যে তিনি রাজা হইবেন এবং রাজাদের মত যুদ্ধ করিবেন এবং ইহুদীদিগকে রাজ্য-হারা পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবেন এবং তাঁহার পূর্ব্বে ইলিয়াস নবী দ্বিতীয় বার মর্ত্যধামে আগমন করিবেন এবং যতক্ষণ ইলিয়াস নবী দ্বিতীয় বার মর্ত্যধামে আগমন না করিবেন ততক্ষণ তিনি আগমন করিবেন না। তারপর যখন হজরত ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হইলেন, তখন ইহুদগণ দুই দলে বিভক্ত হইল। একদল অতি অল্প এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠ ছিল। হজরত মসিহ (আঃ) কে দাউদ (আঃ) এর বংশ সম্ভূত দেখিয়া এবং তৎপর তাঁহার দীনতা-হীনতা এবং সাধুতা দেখিয়া এবং স্বর্গীয় লক্ষণ সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া এবং একজন সংস্কারক সাপেক্ষ তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া পুরা কালের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের নির্দ্ধারিত সময়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া লইল যে তিনিই সেই নবী—ইস্রাইল জাতিকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা হজরত মসিহ (আঃ) এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিল এবং তাহার সাহচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নানারূপ দুঃখ ক্লেশ বরণ করিল এবং খোদার নিকটে নিজেদের সত্যতা প্রকাশ করিল। কিন্তু যেটা ছিল বদবখ্‌তের দল, তাহারা স্পষ্ট চিহ্ন এবং লক্ষণাদির প্রতি অণুমাত্র মনোনিবেশ করিল না, এমন কি, যুগের অবস্থাও তাহারা অণুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিল না। দুষ্ট-জন-সুলভ কুটতর্কের ইচ্ছাবশে মুতাশাবেহাতের দ্বিতীয় অংশ হাতে লুফিয়া লইল এবং একান্ত ঔদ্ধত্য বশে সেই পবিত্র ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল; তাঁহাকে নাস্তিক, অধার্ম্মিক এবং অবিশ্বাসী নামে অভিহিত করিল এবং বলিল যে এই ব্যক্তি পবিত্র লিপি সমূহের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছে ও অন্যায় ভাবে ইলিয়াস (আঃ) নবীর দ্বিতীয় আগমনের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং স্পষ্ট উক্তির বাস্তব রূপায়ণ অস্বীকার করিয়াছে; আমাদের আলেমদিগকে দুরুভি সন্ধিশালী এবং কপটাচারী আখ্যা দিয়াছে এবং পবিত্র গ্রন্থাবলীর বিপরীত অর্থ করিয়াছে। আর একান্ত দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাহারা জোরে শোরে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিল যে নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের একটি অক্ষরও তাহাতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই (সে রাজা হইয়াও আসে নাই। বিজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধও করে নাই এবং আমাদিগকে তাহাদের কবল হইতে মুক্তিও দেয় নাই। তাহার পূর্ব্বে ইলিয়াস নবী (আঃ) ও আসেন নাই। সুতরংং সে কিরূপে মসিহ মাউদ হইল? মোটের উপর, সেই সমস্ত হতভাগ্য ও দুষ্ট চরিত্র ব্যক্তিরা সত্যের জ্যোতিঃ এবং লক্ষণাদির প্রতি দৃষ্টি-পাত করিল না এবং ভবিষ্যদ্বাণী নিচয়ের যে অংশ ছিল রূপক, বাস্তব মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ উহাকেই উপস্থাপিত করিতে লাগিল। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লামার সময়েও অধিকাংশ ইহুদীই এই পরীক্ষায় পতিত হইল। তাহারাও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অভ্যাস অনুসারে নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সেই অংশ হইতে উপকার লাভ করিল না যাহা বাইয়্যেনাতের অংশ ছিল এবং রূপক-রূপী মুতাশাবেহাতের অস্পষ্ট বাণী সমূহকে সম্বল করিয়া অথবা পরিবর্ত্তিত- ভবিষ্যদ্বাণীগুলির প্রতি জোর দিয়া ইহ পরকালের নেতা নবী করীমের আনুগত্য-রূপী সম্পদ হইতে বঞ্চিত রহিল। অধিকাংশ খৃষ্টানগণও এইরূপই করিল। ইঞ্জিলের যে সমস্ত স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লামার সমর্থনে ছিল তদ্রূপ তাহারা দুই হাতে স্পর্শও করিল না এবং আল্লাহর চিরা চরিত বিধান অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের যে অংশ রূপক ও অলঙ্কারের আকারে ছিল তাহারা সেইগুলি লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সেই জন্য তাহারা প্রকৃত মর্ম্মের সন্ধান পাইল না। কিন্তু তাহাদের যে সমস্ত লোক সত্যের অনুসন্ধিৎসু ছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত ঐশী পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত ছিল তাহারা আগমনকারী নবীর সংক্রান্ত ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের দ্বারা উপকৃত হইল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল। যেরূপ ইহুদীদের সেই দল যাহারা হজরত ঈসা (আঃ) কে মানিয়া ছিল তাহারা ভবিষ্যদ্বাণীর বাইয়্যেনাত (স্পষ্ট উক্তি সমূহের) এর প্রমাণকে আকড়িয়া ধরিয়াছিল এবং মুতাশাবেহাত (অস্পষ্ট উক্তি সমূহ) কে বিসর্জ্জন করিয়াছিল, সেই খৃষ্টান প্রবলগণও সেইরূপ করিল এবং তাহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র ভাগ্যবান লোক ইসলামে প্রবেশ করিল। মোটের উপর, ইহুদ ও খৃষ্টান এই দুই জাতিরই যে দল মুতাশাবেহাতকে সম্বল করিয়া অবিশ্বাসের উপর জোর দিয়াছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণীর বাইয়্যেনাত সমূহের দ্বারা উপকৃত হয় নাই, কোরাণের স্থানে স্থানে তাহাদের উল্লেখ আছে। এই উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে তাহাদের বদবখ্‌তি (ভাগ্য হীনতা) দেখিয়া মুসলমান জাতি উপদেশ লাভ করুক এবং ইহুদ ও খৃষ্টানদের মত বাইয়্যেনাত সমূহকে বিসর্জ্জন দিয়া এবং মুতাশাবেহাতগুলিকে আকড়িয়া ধড়িয়া ধ্বংস না হইবার জন্য সাবধান থাকুক এবং আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় সেইগুলি সম্বন্ধে এই আশা পোষণ না করুক যে সেইগুলি সর্ব্বদিক দিয়া জাহেরা (প্রকাশ্য) ভাবে পূর্ণ হইবে এবং এই কথা মানিবার জন্য প্রস্তুত থাকুক যে আল্লাহর পুরাতন বিধান অনুসারে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের কোন কোন অংশ রূপক এবং অলঙ্কারের আকারে থাকে এবং সেই ভাবেই সেইগুলি পূর্ণও হয়। কিন্তু অমনোযোগী এবং স্থূল বুদ্ধি লোকেরা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে যেন এখনও সেই সমস্ত ব্যাপার পূর্ণই হয় নাই, বরং ভবিষ্যতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইহুদিগণ এখনও এই কান্নাই কাঁদে যে ইলিয়াস নবী দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন এবং তৎপর তাহাদের প্রতিশ্রুত মসিহ এক বড় রাজার বেশে আবির্ভূত হইবেন এবং ইহুদীগণকে রাজত্ব দান করিবে। অথচ তদ্রূপ ব্যাপার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তৎপর প্রায় উনিশ শত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং আগমনকারী আসিয়াছেন এবং এই দুনিয়া হইতে উঠিয়াও গিয়াছেন।

এই কথা অতি কার্য্যকরী এবং স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত যে যাঁহারা আল্লাহতা'লার প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আগমন করেন, তাঁহারা রসুল হউন বা নবী হউন, মোহাদ্দেস হউন আর মোজাদ্দেদ হউন তাঁহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকাদিতে অথবা নবীদের মধ্যবর্ত্তিতায় যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় উহা দুই অংশে বিভক্ত থাকে। এক, ঐ সমস্ত লক্ষণ যাহা বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হয়; এইগুলি স্পষ্টোক্তির পর্য্যায় ভুক্ত; দ্বিতীয়, মুতাশাবেহাত যাহা রূপক ও অলঙ্কারের আকারে থাকে। সুতরাং যাহাদের অন্তরে কুটিলতা এবং বক্রতা থাকে, তাহারা মুতাশাবেহাতের অনুসরণ করে এবং সত্যের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ স্পষ্টোক্তি এবং আদেশ নির্দ্দেশ সমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ এই পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের অবস্থা নিরীক্ষণে উপদেশ লাভ করা এবং মাত্র মুতাশাবেহাতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সত্যের

---

*ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের অন্তর্নিহিত সমস্ত কথা একই সঙ্গে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক নহে। বরং ক্রমশঃ তৎসমুদয় পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাও সম্ভব যে কোন কোন ব্যাপার সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির জীবনে পূর্ণ হয় না এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিদের মধ্যে অপর কোন ব্যক্তির হস্তে পূর্ণ হয়।

প্রত্যাখ্যানে ত্বরা না করা এবং যে সমস্ত ব্যাপার আল্লাহর পক্ষ হইতে উদ্ঘাটিত হইয়া যায় নিজেদের পথ নির্দ্দেশের জন্য তৎসমূহ হইতে **উপকার** লাভ করা মোসলমানদের মধ্যে চক্ষুষ্মান **ব্যক্তিদের** কর্ত্তব্য। ইহা তো স্পষ্ট যে **সন্দেহ প্রত্যয়কে নষ্ট করিতে পারে না।** অতএব ভবিষ্যদ্বাণী নিচয়ের সেই অংশ যাহা এখনও প্রকাশ্যভাবে পূর্ণ হয় নাই তাহা এক সন্দেহ সঙ্কুল ব্যাপার কেননা সম্ভবতঃ সেই অংশ ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমনের রূপক আকারে পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু প্রতীক্ষাকারী এই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছে যে কোন দিন তাহা প্রকাশ্যভাবে পূর্ণ হইবে। আর ইহাও সম্ভব যে কোন কোন হাদিসের শব্দ সমূহ অটুট নাই। কেননা হাদিসগুলির শব্দ সমূহ পঠিত অহি (আপ্ত বাণী) সদৃশ নহে এবং অধিকাংশ হাদিসই আহাদের (একক বর্ণনাকারীর) সমষ্টি মাত্র। বিশ্বাসের ব্যাপার আলাদা, যাহা ইচ্ছা তাহাই বিশ্বাস করুন কিন্তু বুদ্ধি ও যুক্তির প্রকৃত এবং সঠিক ফয়সালা ইহাই যে আহাদের মধ্যে শব্দ সমূহের পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখা যায় যে একই হাদিস বিভিন্ন পন্থায় এবং বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মধ্যবর্ত্তিতায় পৌছিয়া শব্দ সমূহের এবং বিন্যাসের অনেক পার্থক্য সৃষ্টি করে অথচ তাহা একই সময়ে একই মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা গেল যে যেহেতু অধিকাংশ বর্ণনাকারীর শব্দ এবং বর্ণনা পদ্ধতি পৃথক পৃথক সেই হেতু বিরোধ দেখা যায়। অধিকন্তু ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মুতাশাবেহাতের অংশ সম্পর্কে ইহাও সম্ভব যে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের ঘটনা নিচয়ের যেগুলি একই সময়ে সংঘটিত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল সেইগুলি ক্রমাগত প্রকাশ পাইবে অথবা অপর কোন ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতায় প্রকাশ পাইবে। দৃষ্টান্ত হইল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লামার এই ভবিষ্যদ্বাণী যাহাতে বলা হইয়াছিল যে রোমক সম্রাট এবং পারশ্য রাজের ধনাগার সমূহের চাবি তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। অথচ ইহা জানা কথা যে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই হজরত (দঃ) এর মৃত্যু হইয়াছিল এবং তিনি রোমক সম্রাট ও পারশ্য রাজের ধনাগার বা চাবি সমূহ দেখেন নাই। কিন্তু যেহেতু ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে সেই চাবিগুলি হজরত ওমর (রাঃ) প্রাপ্ত হইবেন কেননা হজরত ওমর (রাঃ) এর সত্বা প্রতিচ্ছবির দিক দিয়া তাঁহারই সত্বা ছিল সেই জন্য ঐশী বাণীর রাজ্যে হজরত ওমর (রাঃ) এর হস্তই খোদার নবী (দঃ) এর হস্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। মোটের উপর কথা এই যে প্রবঞ্চণা প্রধান লোকেরা এই স্থলেই প্রবঞ্চিত হয়। তাহারা নিজেদের মন্দ ভাগ্যের বশে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেক অংশ সম্বন্ধে এই আশা রাখে যে তাহা অবশ্যই প্রকাশ্য ভাবে পূর্ণ হইবে। আর যখন সময় আসে এবং আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট কোন পুরুষ আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার তৎসমুদয়ের প্রতি অণুমাত্রও দৃষ্টিপাত করে না আর যে সমস্ত লক্ষণ বাহ্যিকভাবে প্রকাশ হয় না অথবা যেগুলির সময় এখনও আসে নাই, সেই গুলিকে তাহারা পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত করে। ধ্বংস প্রাপ্ত যে সমস্ত জাতি সত্য নবীদিগকে মানে নাই তাহাদের ধ্বংসের আসল কারণ এই ছিল যে স্ব স্ব ধারণা অনুসারে তো তাহারা নিজদিগকে অতি হুঁসিয়ার মনে করিত কিন্তু তাহাদের তদ্রূপ আচরণ তাহাদিগকে সত্য গ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

তবলীগে হেদায়েত

(পূর্ব্ব প্রকশিতের পর)

[হজরত মীরজা বশীর আহ্‌মদ সাহেব প্রণীত উর্দ্দু পুস্তকের অনুবাদ]

অনুবাদক—এ, এইচ, এম্, আলী আন্‌ওয়ার

মসিহ্ মাওউদ ও মাহ্‌দী মাওউদ একই ব্যক্তি ঃ

হজরত মসিহ্ নাসেরীর মৃত্যু এবং তৎ-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সংক্ষেপে আলোচনার পর এখন আমরা যে প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা হইল মসিহ মাওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী কি একই ব্যক্তি? না, ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। জানা আবশ্যক; আজকাল সাধারণতঃ, মোসলমানগণ মনে করেন যে, মসিহ্ এবং মাহ্‌দী দুই জন পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, ইহা সম্পূর্ণ মারাত্মক। ইহা আঁ হজরতের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) পবিত্র বাণীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত। কিন্তু এই গবেষণার প্রারম্ভে সংক্ষেপে ইহা বলা অবশ্যক হে, মাহ্‌দী সম্বন্ধে মোসলমানগণ কি কি মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, জানা আবশ্যক, মাহ্‌দী সম্বন্ধে বর্ণনাগুলি এত পরস্পর বিরোধী ও অনৈক্যে ভরতি যে, পড়িলে অবাক হইতে হয়। অনৈক্য শুধু এক বিষয়ে নহে। প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে মত বিরোধ বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্থলে, মাহ্‌দীর বংশ সম্বন্ধে এত অনৈক্য রহিয়াছে যে, খোদার শরণ নেওয়া কর্ত্তব্য। এক দল বলেন, মাহ্‌দী হজরত ফাতেমার (রাঃ) **বংশধর হইবেন।** কিন্তু এই সম্প্রদায় ও আবার তিন ভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধর হইবেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ইমাম হোসেনের (রাঃ) বংশধর হইবেন। অপর এক সম্প্রদায় বলেন, তিনি ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসেন (রাঃ) উভয়েরই বংশধর হইবেন। অর্থাৎ মাতা ইমাম হাসানের বংশধর হইলে, পিতা হইবেন ইমাম হোসেনের বংশধর; কিম্বা পিতা ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধর হইলে মাতা হইবেন ইমাম হোসেন (রাঃ) বংশধর। তারপর, আর এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা বলেন যে, মাহ্‌দী হজরত ফাতেমার (রাঃ) বংশধর না হইয়া হজরত আব্বাস (রাঃ)এর বংশধর হইবেন। তারপর কোন কোন হাদিসে পাওয়া যায় যে, মাহ্‌দী বিশেষ কোন বংশেই জন্ম গ্রহণ করিবেন না, তিনি আঁ হজরতের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) উম্মত হইতে হইবেন। এই ছাড়া মাহ্‌দী ও মাহ্‌দীর পিতার নাম সম্বন্ধে অনৈক্য আছে। কোন কোন হাদীসে 'আহ্‌মদ' এবং কোন কোন হাদীসে ঈসা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুন্নিদের মতে পিতার নাম আবদুল্লাহ্। কিন্তু শিয়াগণ বলেন যে, তাঁহার পিতার নাম হাসান হইবে। তদ্রূপ, মাহ্‌দী জাহের হওয়ার স্থান সম্বন্ধেও মতভেদ বিদ্যমান। তারপর, মাহ্‌দী কত কাল পৃথিবীতে কাজ করিবেন, সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বস্তুতঃ, মাহ্‌দী সংক্রান্ত প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই মতানৈক্য বিদ্যমান। আরো মজার বিষয়, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্ব স্ব দাবীর সমর্থনে হাদীস সমূহ উদ্ধৃত করেন। (নবাব আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান প্রণীত 'হুজাজুল্-কারামাহ্' দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, ইত্যাকার অবস্থায় মাহ্‌দী সম্বন্ধে যতগুলি হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের সকলগুলিই সহীহ্ বলিয়া মান্য করা যায় না। এই কারণেই ইমাম বুখারী (রহ্‌মতুল্লাহ্ আলায়হে) এবং ইমাম মোস্‌লেম (আলায়হে রহমত) তাঁহাদের দুই সহীহ্‌তে মাহ্‌দী সম্বন্ধে কোন অধ্যায় সংযোজিত করেন নাই। কেনন না, তাঁহারা এই সকল হাদীসের কোন একটিও নির্ভর যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। সেইরূপ ওলামাগণও মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীস গুলিকে "জয়ীফ" বা দুর্ব্বল বলিয়াছেন, এবং পরিস্কার লিখিয়াছেন যে, মাহ্‌দী সংক্রান্ত যত বর্ণনা, যত রেওয়াতে আছে, কোন একটিও জেরার বহির্ভূত নহে। ('হুজাজুল-কেরামাহ্')।

এখন, স্বভাবতঃ, প্রশ্ন হয়, এই প্রকার মতভেদের কারণ কি? আমরা যতখানি চিন্তা করিয়াছি, তাহাতে কতকটা কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, যদিও একজন মাহ্‌দী সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াদা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) সাধারণ ভাবে কতিপয় মাহ্‌দীর সংবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় জাহের হওয়ার ছিলেন। এই জন্য এই সকল রেওয়ায়েতে অনৈক্য থাকা স্বাভাবিক। শুধু এই ভুল হইয়াছে যে, জন সাধারণ এই সকল রেওয়ায়েত একই ব্যক্তি সংক্রান্ত বলিয়া মনে করিতে থাকে। অথচ, এগুলি ছিল বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে।

(১) 'ওফাতে মসিহ্' প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে কোনরূপ বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে হইলে, গ্রন্থকার প্রণীত "আল-হুজ্জাতুহ বালেগা' (উর্দ্দু) দ্রষ্টব্য।

অপিচ, ইহাও সত্য এবং আমাদের 'মোশাহাদা' (অভিজ্ঞতা) ও ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক সম্প্রদায় যাবতীয় আশীষ আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে তৎপর হয়। সুতরাং, আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) যখন ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, তাঁহার উম্মতে একজন মাহ্‌দী হইবেন, উত্তর কালে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই চাহিল প্রতিশ্রুত মাহদী তাহাদেরই মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন। সকলেই মুত্তাকী এবং খোদা ভীরু হয় না। কেহ কেহ এরূপ হাদিসগুলি উদ্ভাবন করিল যে, ইহাই প্রকাশ পাইত যে, মাহ্‌দী তাহাদেরই গোত্র হইতে হইবেন। এই কারণেই মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদিস সমূহে এত অনৈক্যের উদ্ভব হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে এত অধিক বিশৃঙ্খলা পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল হাদীস মাহ্‌দী কোন বিশেষ কুলজ হইবেন বলিয়া নির্দ্দেশ করে না এবং শুধু এইটুকু শিক্ষা দেয় যে, তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়ারই একজন ব্যক্তি মাত্র হইবেন, এই হাদিসগুলি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহাদিগকে জাল বলিবার সঙ্গত কারণ নাই। কারণ মাহ্‌দী উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ব্যক্তি বিশেষ হইবেন বলিয়া হাদিস তৈরী করিবার মত কাহারো কোন প্রকার প্রয়োজন কি থাকিতে পারিত? অবশ্য, যে সকল হাদিস মাহ্‌দীকে বিশেষ কোন গোত্রজ হইবেন বলিয়া নির্দ্দেশ করে উহাদের সম্বন্ধে এই সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয় যে, পরবর্ত্তী কালে সেইগুলি উদ্ভাবন করা হয়।

সুতরাং এই সকল অনৈক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে, যেন মাহ্‌দীকে গোত্র বিশেষের ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ না করিয়া সমবেত ভাবে আমরা এই ইমান রাখি যে আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) এমন একজন মাহ্‌দী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার উম্মতের মধ্যে আখেরী জামানায় জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইহাতেই আমাদের মঙ্গল। ইহাই সতর্কতা মূলক পথ। কারণ যদি আমরা বিশ্বাস পোষণ করি যে, মাহদী ফাতেমীয় বংশজ হইবেন, কিন্তু তিনি আব্বাসীয় কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে উক্ত বিশ্বাস আমাদের পথে বড়ই বাধার সৃষ্টি করিবে এবং আমরা মাহদীর প্রতি ইমান আনা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। সেইরূপ যদি আমরা এই মত পোষণ করি যে, মাহদী বনি-আব্বাস হইতে হইবেন, কিন্তু তিনি ফাতেমীয় কুলে জন্ম গ্রহণ করেন বা হজরত ওমরের (রাঃ) বংশধরের মধ্য হইতে তিনি জাহের হন, তবে আমরা তাঁহার প্রতি ইমান আনা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। সুতরাং আর কিছু না হউক, অন্ততঃ আমাদের ইমান বাঁচাইবার জন্য মাহদীকে বিশেষ কোন গোত্রজ বলিয়া সাব্যস্ত না করিয়া আমাদের এই ইমান রাখা কর্ত্তব্য যে, মাহদী উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় জাহের হইবেন এবং মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম)এর খাদেম ও অনুবর্ত্তীদেরই মধ্যে একজন হইবেন। এই প্রকার ইমান রাখার ফলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিব। আর যদি আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) বাস্তবিকই মাহ্‌দী কোন বিশেষ গোত্রজ হইবেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, অঙ্গ বিশেষ সম্যক বস্তুরই অন্তর্গত।

আরো একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মাহ্‌দীর নাম এবং তাঁহার পিতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবু, অধিকতর প্রবল মত ইহাই চলিয়া আসিয়াছে যে, মাহদীর নাম মোহাম্মদ এবং তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ্‌ হইবে। প্রকৃত পক্ষে, এই মতের সমর্থন সূচক যে সকল রেওয়াএত আছে, সেগুলি জেরার বহির্ভূত না হইলেও অন্যান্য রেওয়াএত অপেক্ষা রেওয়াএতের নিয়ম কানুনের দিক দিয়া অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং যদি আমরা এই উক্তিকে প্রাধান্য দেই, তবে ইহা ইন্‌সাফের বিরোধি হইবে না। কিন্তু এই অবস্থায়ও হজরত মীর্জ্জা সাহেবের দাবীর উপর কোন বিরুদ্ধ প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। কারণ, সুরাহ্‌ জুমার আয়েত 'ওআখারীনা মিন্‌হুম্‌, (তাহাদেরই অপর সম্প্রদায় যাহারা এখনো তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয় নাই') হইতে এই সন্ধান পাওয়া যায়, আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) আখেরী জমানায় এক জাতির রূহাণী তরবিয়ত করিবেন; তিনি তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিবেন। ইহার অর্থ শেষ জমানায় তাঁহার একজন পূর্ণতম 'বরুজ' (প্রতিবিম্ব) আবির্ভূত হইবেন। তিনি তাঁহার রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া এক জমাতের শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবেন। সুতরাং, আমারা বলি, আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) অঙ্গীকৃত মাহদীর নাম "মোহাম্মদ" এবং তাঁহার পিতার নাম "আবদুল্লাহ্‌" এই অর্থ প্রতিপাদনার্থেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাহদীর কোন নিজস্ব স্বাধীন সত্তা নাই, বরং তিনি সুরাহ্‌ জুমায় কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর সেই কামেল 'বরুজ' পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া। অন্য কথায় মাহদীর নাম সম্বন্ধে মোহাম্মদ বিন-আবদুল্লাহ্‌ ব্যক্ত করায় তাঁহার নামও ঠিকানার পরিচয় করানো উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ইহাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, মাহদীর আবির্ভাব রসূল করীমেরই (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) আবির্ভাব এবং মাহদীর অস্তিত্ব তাঁহারই অজুদ স্বরূপ। আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) কথায় ইহারই প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান। কারণ, হাদিসে একথা বলা হয় নাই যে, মাহদীর নাম "মোহাম্মদ" বিন্‌ আবদুল্লাহ্‌" হইবে, বরং আঁ-সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম প্রকৃত পক্ষে বলিয়াছেন:—"ইয়ুওয়াতি ইসমুহু ইস্‌মি ওইস্‌মুহু আবিহে ইসমুহু আবি" ('মিশ্‌কাত' বাবু-আশ্‌রাতিস্‌ সা'আ)।

"মাহদীর নাম আমার নাম হইবে এবং মাহদীর পিতার নাম আমার পিতার নাম হইবে।" বলার কৌশলই তাঁহার উদ্দেশ্য প্রমাণিত করে।

দ্বিতীয় কথা, মাহদীর গোত্র সম্বন্ধে অধিক সহীহ্‌ উক্তি হইল তিনি আহ্‌লে-বয়েত বা পৌরজন হইতে হইবেন। অন্যান্য উক্তিগুলি ইহার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর। ইহাকেও যথার্থ বলিয়া মনে করায় কোন প্রমাদ ঘটে না কারণ, আমরা দেখিয়াছি, "আখারীনা' মিনহুম্‌" (তোমাদেরই মধ্য হইতে অন্যেরা") সম্বলিত আয়েত অবতীর্ণ হইলে পর সাহাবাগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করায় আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) সালমান ফারসীর (রাঃ) পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন:— "লাও কানাল্‌ ইমানু ইন্‌দাস্‌ সুরাইয়্যা লা-নালুহু রাজুলুম্‌ মিন্‌ হাউলাআয়ে" ('মিশ্‌কাত' বাবু জামে ওল-মুনাকেব)।

"ইমান পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া সপ্তর্ষী মণ্ডলে গমন করিলেও এই সকল পারস্য দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন উহাকে তথা হইতে ধরায় ফিরিয়া আনিবেন।" অন্য কথায়, তিনি মাহদীকে হজরত সালমানের জাতি হইতে হইবেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। সালমান (রাজি আল্লাহু আন্‌হু) পারস্য বংশীয় ছিলেন। পক্ষান্তরে, আমরা দেখিতে পাই, আহ্‌জাব যুদ্ধের সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "সাল্‌মানু মিন্না আহ্‌লিল্‌ বায়েতে" ('তাবারী')।

"সালমান আমাদেরই পরিবার ভুক্ত, আমারই আহ্‌লে বয়েত।" সুতরাং মাহদী সম্বন্ধে 'আহ্‌লে বয়েত' (পৌরজন) বলাতেও হজরত মীরযা সাহেবের দাবীর বিরোধিতা হয় না, বরং উহারই সমর্থন করে। ইহা একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব। ইহা ভুলিতে হইবে না। ভাষান্তরে প্রতিশ্রুত মাহদী এক দিকে সহীহ্‌ হাদীস অনুযায়ী পারস্য বংশীয় বলিয়াও নির্ণীত হন এবং অন্য দিকে সাধারণ রেওয়াএতগুলি অনুসারে তিনি 'আহ্‌লে বয়েত' (তাঁহার পরিবারভুক্ত) বলিয়াও সাব্যস্ত হন।

ইহা ছাড়া আমরা দেখিতে পাই, আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) মসিহ্‌ ও মাহদী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইয়ুদফানু মা'য়ী ফি কাব্‌রি" ('মিশ্‌কাত' কেতাবুল ফতন, বাব নজুলে ইসা-ইবনে মরিয়ম)।

"তিনি আমার সহিত আমার কবরে সমাহিত হইবেন।" ইহাতেও সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নতুবা আল্লাহ্‌ পানাহ্‌, কোন দিন আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম)এর কবর উপড়ানো এবং উহাতে মসিহ মাহদীকে দাফন করা হইবে, এইরূপ ধারণা করা নির্ব্বুদ্ধিতা ও লজ্জাহীনতার পরিচায়ক মাত্র। কোন সাচ্চা, গয়রতশীল মোসলমান এক সেকেণ্ডও ইহা সহ্য করিবে না। সুতরাং ইহাই সত্য যে, এই প্রকার যাবতীয় উক্তি দ্বারা আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে মাহদী তাঁহার 'কামেল বরুজ' পূর্ণ প্রতিবিম্ব হইবেন এবং তাঁহার আগমনে যেন তিনিই (সাঃ) আসিবেন। (ক্রমশঃ)

মোস্‌লেহ্‌ মাউদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

রাবওয়ার পত্তন ঃ

কাদিয়ান হতে হিজরত করে আহমদীগণকে শুধু ব্যক্তিগত পুনর্বসতির সম্মুখিন হতে হয় নাই তাদেরকে নূতন করে জামাতের পুনর্বসতিরও সম্মুখিন হতে হয়। কথাটা আরো একটু বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। আহমদীয়ত ধর্ম্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। রসুল করীম ছাঃ যে আদর্শ নিয়ে ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আরবে আবির্ভূত হয়ে ছিলেন সেই কোরাণিক আদর্শকে নিজের জীবনে পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করে দুনয়াময় তাহা প্রচার করা প্রত্যেক আহমদীর সর্ব প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য সে তার জান, মাল সব কিছু কোরবান করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাই সে তার নিজের বসবাসের স্থান করে নিয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করাকেই যথেষ্ট মনে করে না; এই নিয়েই সে ক্ষান্ত হতে পারে না—শত দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর দিয়েও সচেষ্ট হয় কি করে সে তার আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে পারে, তা করতে গিয়ে হিজরতের চরম সঙ্কটের সময়েও সে আদর্শ চ্যুত হয়নি। সে নিজকে বিপন্ন করেও যখনই হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, মুসলমান যাকেই বিপদগ্রস্ত ও অত্যাচারিত হ'তে দেখেছে তাকেই সাহায্য করেছে। তাই দেশ বিভাগের সময় পাঞ্জাবে আহমদীদের প্রচেষ্টায় হাজার হাজার মুসলমানের জীবন রক্ষা পেয়েছে। ফলে চতুর্দ্দিক হতে তাদের খেদমতের প্রসংশাবাণী শুনা গিয়েছে। কিন্তু কিছু দিন পর যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা থেমে গেল, অবস্থা—যখন অনেকটা শান্ত হয়ে আসল তখনই আবার আহমদীয়তের বিরুদ্ধেও অযথা নানা আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। এই সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতেই আহমদীয়া জামাতের পুনর্বসতির কথা বিচার করে দেখতে হবে।

হিজরতের সাথে সাথে বাধ্য হয়েই আহমদীগণকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হয়। জামাতের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে নূতন করে চালু করতে হলো। জামাতের অফিসাদিকে বিভিন্ন জায়গায় স্থান দিতে হয়। এতে কাজের নানা অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু মাহ্‌মুদ দমিবার পাত্র নন। সমস্যা যত বড় ও জটিল হয় মাহ্‌মুদ ততই খোদার দিকে ঝোকেন, ততই তাঁর শক্তি ও প্রেরণা বেড়ে চলে। আর্থিক অনটনের চরম সঙ্কটেও আহমদীয়া জামাতের তবলিগ ও তালিম তরবিয়তের কাজ বন্ধ হয় নাই; খেদমতে খালকের কাজ থামে নাই। এই সকলের ভিতর দিয়েও মাহ্‌মুদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ছিল কি করে পাকিস্তানে আহমদীদের একটা কেন্দ্র স্থাপন করা যায়, দারুল খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করা যায়। অবশেষে ঝং জিলার চিনিউট সহরের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক পাহাড়ী, মরুভূমিতে মাহ্‌মুদ আহমদীয়তের কেন্দ্র স্থাপন করলেন।

এই মরু অঞ্চলে সহস্রাধিক একর আবাদের অযোগ্য ভূমি খরিদ করে নেওয়া হল। রাবওয়া নাম দিয়ে ২০শে সেপ্টেম্বর হজরত মাহ্‌মুদ আহমদীয়তের দারুল খেলাফত ও কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে হজরত ঈসা আঃ তাঁহার মাকে সাথে নিয়ে হিজরত করে যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানের নাম রাবওয়া বলে কোরআন শরিফে উল্লেখ আছে। হজরত মাহ্‌মুদ ও তাঁহার মাতা ওম্মুল মোমেনীন (রাঃ)কে সাথে নিয়েই হিজরত করেছিলেন। রাবওয়া প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনিও জীবিত ছিলেন।

রাবওয়াতে পানি ছিল না। এই অঞ্চলে ভাল পানি পাওয়া যায় না বলেই লোকের ধারণা ছিল। এমন কি বিশেষজ্ঞদেরও মত অনেকটা তাই ছিল। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমানের অপার মহিমায় দরিয়াও শুকাইতে পারে—আবার পাহাড়েও পানি আস্‌তে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরেও বসতি হতে পারে—আবার হিমালয়ও ধূলিসাৎ হতে পারে। মাহ্‌মুদ তাঁর জামাতকে নিয়ে রাবওয়ার জন্য দোয়া করতে লাগলেন। সুপেয় ও পর্য্যাপ্ত পানি না হলে—কোন বসতিই গড়ে উঠতে পারে না—সহর গড়ে তোলার কোন কথাই উঠতে পারে না। 'জীবন' ছাড়া ত আর জীবন টিকে না। আল্লাহতা'লার ফজল নাজেল হলো। পানির সন্ধান করতে গিয়ে—আচাণক সুপেয় পানির সন্ধান পাওয়া গেল—ফলে আহমদীয়া জামাতের প্রাণে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। ধীরে ধীরে এই মরু পাহাড়ী অঞ্চল নতুন নামে, নতুন প্রাণে, নতুন গানে কর্ম্ম চঞ্চল হয়ে উঠলো—ধীরে ধীরে ইহা একটা আধুনিক সহরের রূপ নিতে লাগলো।

রাবওয়ায় আবাদের অযোগ্য মরু ও পাহাড়ী অঞ্চল নিয়েও বিরুদ্ধবাদিরা আহমদীদের বিরুদ্ধে কম অপপ্রচার করেনি। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকগণ এ নিয়ে বহু কথা বলবে। এখানে শুধু একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে রাবওয়া একটা আধুনিক ও আন্তরজাতিক সহরের রূপ নিচ্ছে—এর পিছনে কোন রাজ-শক্তি কাজ করছে না; রাবওয়াতে ব্যবসায় বাণিজ্যের কোনই সুবিধা নেই; এখানে কোন শিল্প কারখানাও নেই; এখানে কোন স্বাস্থ্য নিবাসও নেই। তবে কিসের টানে, কিসের আহবানে দূর দুরান্ত হতে, দেশ বিদেশ হতে হাজার হাজার লোক তাদের আরাম আয়াশকে ত্যাগ করে এখানে এসে নিজদিগকে ধন্য মনে করছে। কোন্ শক্তির বলে এই মরু অঞ্চল এখন শস্য শ্যামল হয়ে উঠেছে; প্রাণের প্রাচুর্য্যে মেতে উঠছে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে—হজরত মসিহ মাওদ আঃ এর নিকট অবতীর্ণ আল্লাহ-তা'লার বাণীই স্মরণ করতে হয় যে—দুনয়ার সায়ীত রুহ্‌গণ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে একত্রিত হবে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফা ও প্রতিশ্রুত পুত্র মাহ্‌মুদ রয়েছেন। তাঁর সাথেও যে আল্লাহতা'লার সংযোগ রয়েছে—তারই চিহ্ন হল—রাবওয়ার বর্তমান অগ্রগতি।

১৯৪৯ সাল হতে রাবওয়াতে সালানা জলসা হয়ে আসছে। রাবওয়া হতে এখন 'দৈনিক আল-ফজল' মাসিক ইংরেজী 'রিভিও অব রিলিজিয়নস্' (Review of Religions), মাসিক 'ফোরকান' এবং মহিলাদের পরিচালিত মাসিক 'মিছবা' এবং তরুণদের পরিচালিত মাসিক 'খালেদ' প্রকাশিত হচ্ছে। আহমদীগণের দৃষ্টি কোন্ হতে বিচার করতে গেলে—বলতে হয় যে দুনয়াতে যে নৈতিক বিপ্লব আসছে—তার শক্তি কেন্দ্রই হলো—রাবওয়া। এখানে নতুন দুনয়া গড়ে তোলার সাধনা চলছে। অচেনা অজানা স্থান হতেই—অনেক সময়ে দুনয়ার ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে থাকে—রাবওয়াতেও তাই হচ্ছে। সর্বশক্তিমান তাদের এই সাধনা ফুলেফলে সুশোভিত করে তুলুন! আমীন।

হজরত ওম্মুল মোমেনীনের (রাঃ) মৃত্যু ঃ

১৯৫২ সালে রাবওয়াতে হজরত উম্মুল মোমেনীন (রাঃ) ওফাত লাভ করেন। তাঁর মৃত্যু সারা জমাতকে শোকে অভিভূত করে ফেলে। তিনি শুধু আদর্শ নারীই ছিলেন না; ব্যক্তিগত জীবনে স্নেহ মমতার মূর্ত্ত প্রতীক স্বরূপ ছিলেন। তা' ছাড়া তিনি ওয়াহী এলহাম পেয়ে থাকতেন। এই মহীয়সী মহিলা—মাহমুদের একটা শক্তি কেন্দ্র ছিলেন। ওম্মুল মোমেনীনের মৃত্যু—মাহমুদের ব্যক্তিগত জীবনে একটা অত্যন্ত বড় ঘটনা। কিন্তু মাহমুদ তাতে মুচড়ে পড়েন নি। শোকে দুঃখে, সুখে শান্তিতে মোমেন বান্দা তাঁর স্রষ্টার দ্বারেই হাজির হয়। সে জানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শেষ আশ্রয় স্থল হল সেই পরম পিতা—যিনি পরম দয়ালু ও সর্বশক্তিমান!

(ক্রমশঃ)

শীঘ্রই খরিদ করুন

"কিশ্‌তিয়ে নূহ্‌" (২য় সংস্করণ)

প্লেগ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) শিক্ষা

[মূল্য ১।০ মাত্র]

ম্যানেজার, মকৃতবা আহ্‌মদীয়া

৪ নং বক্‌শিবাজার রোড, ঢাকা